আজ ও আগামীর স্মার্টসিটি

গোলাপ মুনীর

কারও কাছে স্মার্টসিটির কথা তুলুন, প্রথমেই লোকেরা প্রশ্ন করবে : স্মার্টসিটি আবার কী? স্মার্টসিটি কোথায় আছে? দুর্ভাগ্য, সহজে এর কোনোটিরই উত্তর দেয়া যাবে না। 'স্মার্ট' শব্দটির অর্থ বিভিন্ন নগরীর জন্য বিভিন্ন। কোনো নগরীর বেলায় স্মার্ট বলতে বুঝায় দূষণমুক্ত কিংবা অতি ঘনবসতিমুক্ত একটি নগরী– যেখানে ব্যবহার হবে নানা সেন্সর ও ডাটা অ্যানালাইসিস। আবার অন্য নগরীর বেলায় স্মার্ট বলতে বোঝাবে অধিকতর সবুজাভ নগরী– যেখানে থাকবে বাইক-শেয়ারিং স্কিম কিংবা আরও বেশি সংখ্যক উদ্যান। আবার কারও কাছে স্মার্টসিটি হচ্ছে সেই সিটি, যেখানে থাকবে অত্যাধুনিক আইসিটি সেবার যাবতীয় সুবিধা।

একটি স্মার্টসিটি চিহ্নিত করতে হয় কীভাবে? স্মার্টসিটি হিসেবে একটি নগরীর অবস্থান নির্ণয় করতে ছয়টি অক্ষ বা দিক বিবেচনা করা হয়। এগুলো হলো : স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট মোবিলিটি, স্মার্ট এনভায়রনমেন্ট, স্মার্ট পিপল, স্মার্ট লিভিং ও স্মার্ট গভর্ন্যান্স। এই ছয়টি অক্ষ সংশ্লিষ্ট রয়েছে নগরের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের প্রচলিত আঞ্চলিক ও নয়া দ্রুপদ (নিওক্লাসিক্যাল) তত্ত্বগুলোর সাথে। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, এসব অ্যাক্সিস বা অক্ষগুলোর যথাক্রমিক ভিত্তি হচ্ছে : আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার তত্ত্বসমূহ, পরিবহন ও আইসিটি অর্থনীতি, প্রাকৃতিক সম্পদ, মানব ও সামাজিক মূলধন, জীবনমান এবং নগর প্রশাসনে নাগরিক সাধারণের অংশগ্রহণ। এর অর্থ একটি নগরকে তখনই 'স্মার্ট' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যাবে, যখন এ নগরে একটি অংশগ্রহণমূলক প্রশাসনের মাধ্যমে বিনিয়োগ চলবে মানবিক ও সামাজিক মূলধনায়ন, পরিবহন ও আধুনিক আইসিটি অবকাঠামো, টেকসই অর্থনীতির উন্নয়ন, উঁচু জীবনমান এবং প্রাকৃতিক সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনায়।

একটি স্মার্ট বা স্মার্টার সিটিতে নগরবাসীর কল্যাণবহ কর্মকাণ্ড জোরদার করে তোলা ও সম্পদ ভোগের খরচ কমিয়ে আনার জন্য ব্যবহার করা হয় ডিজিটাল প্রযুক্তি। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্মার্টসিটির সিটিজেনদের জীবনযাপনকে যথাসম্ভব সুখকর করে তোলার প্রয়াসই এখানে গুরুত্ব পায়। স্মার্টসিটি সংশ্লিষ্ট সিটি ও বাইরের দুনিয়ায় চ্যালেঞ্জ যত বেশি দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে পারবে, সেই নগরী তত বেশি স্মার্টার বলে বিবেচিত হবে। স্মার্টসিটির মুখ্য 'স্মার্ট' খাতগুলো হচ্ছে : পরিবহন, জ্বালানি, স্বাস্থ্যসেবা, পানি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। মানুষ বড় ধরনের নানা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছে স্মার্টসিটি গড়ে তোলার প্রতি। আর এ ক্ষেত্রে মানুষ হাতিয়ার হিসেবে হাতের কাছে পেয়েছে ডিজিটাল টেকনোলজি বা আইসিটিকে।

আরব আমিরাতের কার্বন-নিউট্রাল মাসদার নগরী

তাই স্মার্টসিটি আজ 'ইন্টেলিজেন্ট সিটি' বা 'ডিজিটাল সিটি' নামেও অভিহিত হচ্ছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন আন্তরিকভাবে অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে মেট্রোপলিটান সিটি এলাকায় স্মার্টসিটির প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারে। অরূপ গ্রুপ লিমিটেড নামের একটি বহুজাতিক কোম্পানির দেয়া হিসাব মতে, বিশ্বে স্মার্ট আরবান সার্ভিসের বাজারের আয়তন ২০২০ সালে বছরে ৪০ হাজার কোটি ডলারে পৌঁছুবে। উল্লেখ্য, 'অরূপ' হচ্ছে একটি বহুজাতিক প্রফেশনাল সার্ভিস ফার্ম। এর সদর দফতর লন্ডনে। জনবল ১১ হাজার। ৪২টি দেশে রয়েছে এর ৯২টি অফিস। এটি ১৬০টি দেশের প্রকল্পে অংশ নিয়েছে। এর উপস্থিতি রয়েছে আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, পূর্ব এশিয়া, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে। এর মালিক একটি ট্রাস্ট। এ ট্রাস্টের বেনিফিশিয়ারি অরূপের বর্তমান ও সাবেক চাকুরেরা।

এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি নগরী গড়ে তোলা হয়েছে 'স্মার্টসিটি' ধারণাটি মাথায় রেখে। যেমন– দক্ষিণ কোরিয়ার সংদু, যার অবকাঠামোতে হাইটেকের সম্মিলন ঘটানো হয়েছে। কিংবা নাম উল্লেখ করা যায় আরব আমিরাতের মাসদার গ্রিনসিটির কথা, যা নির্মিত হয়েছে নগরটিকে কার্বন-নিউট্রাল রাখার ধারণা মাথায় রেখে। এমনকি পৃথিবীর কারিগরি দিক থেকে সবচেয়ে অনগ্রসর এলাকার নগরীতেও স্মার্ট নগরীর বিষয়-আশয় লক্ষণীয়। যেমন– তাঞ্জানিয়ার রাজধানী শহর দারুসসালামের নগরায়নেও সংযোজিত হয়েছে OpenStreetMap-এর মতো অ্যাপস। এ ছাড়া কেপটাউনের বাইরে স্টেলেনবুশে গড়ে তোলা হচ্ছে স্মার্ট স্লাম তথা স্মার্টবস্তি– যেখানে বাড়ির ছাদে স্থাপিত সোলার প্যানেলগুলো থেকে সরবরাহ হচ্ছে বিদ্যুৎ, সেখানকার বাসিন্দারা মোবাইল ফোনে কিনতে পারছেন বিদ্যুৎ। স্মার্টসিটির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শিকাগো, বোস্টন, বার্সেলোনা ও স্টকহোমের নামও।

পুরস্কার বিজয়ী গ্লাসগো ও ব্রিস্টল

যুক্তরাজ্য নিজ দেশেই শুধু স্মার্টসিটি গড়ে তুলছে না, বরং একই সাথে দেশটি স্মার্ট টেকনোলজির ক্ষেত্রে বিশ্ব নেতৃত্বের পর্যায়ে উঠে এসেছে। এর স্মার্টসিটি প্রোগ্রামকে প্রণোদিত ও উদ্দীপ্ত করে তোলার জন্য যুক্তরাজ্য সরকার ২০১৩ সালে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার হিসেবে বিজয়ী গ্লাসগোকে নগরীর উন্নয়নে স্মার্ট টেকনোলজি খাতে খরচ করতে দেয়া হয় ২ কোটি ৪০ লাখ পাউন্ড। স্মার্টসিটি গড়ায় গ্লাসগো এখন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। ২০১৪ সালের জুলাইয়ে গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত হয় কমনওয়েলথ গেমস। এতে ৭১টি দেশ ও টেরিটরির ৪,৯৫০ জন খেলোয়াড় অংশ নেন। কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের সুবাদেও গ্লাসগো কিছুটা স্মার্ট হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। এরপরও এ নগরীর রয়েছে কিছু সামাজিক সমস্যা। এ নগরীর মানুষের লাইফ-এক্সপেকট্যান্সি যুক্তরাজ্যের অন্যান্য নগরীর তুলনায় সবচেয়ে কম। পুরস্কার হিসেবে পাওয়া অর্থ থেকে একটা অংশ খরচ হবে বিগ ডাটার পেছনে, অর্থাৎ 'গ্লাসগো কোয়েশ্চন' নামের সমস্যা সমাধানে। এ সমস্যাটি হচ্ছে– নগরীর সাত মাইলের ব্যাসার্ধের মধ্যে মানুষের লাইফ-এক্সপেকট্যান্সি ২৮ বছর কমে গেছে। কিছুটা অর্থ খরচ হতে পারে নগরীর জ্বালানি দক্ষতা বাড়ানোর কাজে, যেখানে নগরবাসীকে তাদের আয়ের বড় একটা অংশ খরচ করতে হয় জ্বালানি খরচের ▸

গ্লাসগো : বিশ্বের স্মার্টসিটিগুলোর একটি

পেছনে। কিংবা কিছু অর্থ খরচ হবে জনপরিবহনে গতিশীলতা আনার কাজে। কারণ, নগরীর অনেক এলাকায় পরিবহন ব্যবস্থা এখনও অনেক দুর্বল।

পুরস্কারের অর্ধেক অর্থ এরই মধ্যে খরচ হয়ে গেছে একটি অপারেশন সেন্টার গড়ে তোলার পেছনে। এ সেন্টারটি অনেকটা ব্রাজিলের শহর রিওডি জেনিরোর অপারেশন সেন্টারের মতোই। এর একটি কক্ষ পরিপূর্ণ শুধু পর্দা আর পর্দায়। এসব পর্দা মনিটর করে পুলিশ, ট্রাফিক কর্তৃপক্ষ ও জরুরি সেবা সংস্থার লোকজন। অপরাধ দমনে সহায়তা দেয়া এ নগরীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এখানে সমাজবিরোধী আচার-আচরণ বেশ প্রবল। নগরীতে এরই মধ্যে ৪০০ হাই রেজ্যুলেশনের ক্যামেরা বসিয়ে এর সিসিটিভি সিস্টেমের উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। তা ছাড়া পরিকল্পনা চলছে কী করে বিগ ডাটার ওপর গবেষণা চালানো যায়, যাতে আগে থেকেই অপরাধের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। এরা অর্থ বিনিয়োগ করছে ইন্টেলিজেন্ট লাইটিংয়ের পেছনেও, যাতে নগরবাসীর জ্বালানি বিল কমিয়ে আনা যায়। ইন্টেলিজেন্ট লাইট সংযুক্ত থাকবে সিকিউরিটি ক্যামেরার সাথে। কিছু অর্থ খরচ হবে জনগণের কাজে, কিছু সিটি ডাটা উন্মুক্ত করে দেয়ার কাজে, যাতে লোকজন একটি ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে এ ডাটায় প্রবেশ করতে পারে। এ ছাড়া উদ্ভাবন করা হয়েছে 'মাইগ্লাসগো' নামের একটি স্মার্টফোন অ্যাপ। এর মাধ্যমে নগরবাসী এদের সমস্যার কথা জানাতে পারে। এরপরও বলতে হবে, স্মার্টসিটি গড়ে তোলার জন্য এর তৎপরতা খুব একটা সুষ্ঠু নয়। আছে নানা অভিযোগ-অনুযোগ।

অপরদিকে ইংল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলের ব্রিস্টল বেশ উদ্দীপ্ত এর স্মার্টসিটি পরিকল্পনা নিয়ে। 'ব্রিস্টল ফিউচার্স'-এর প্রধান স্টিফেন হিল্টন বলেন, 'আমরা জিতে নিয়েছি ৩০ লাখ পাউন্ডের রানারআপ প্রাইজ। অতএব, এই অর্থ আমরা কী করে খরচ করব, সে ব্যাপারে আমাদের ওপর চাপ কম।' তিনি আরও বলেন, 'কন্ট্রোল সেন্টার গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ব্রিস্টলের নজর এর নাগরিক ও অভিজ্ঞতার ওপর।'

এর পরিকল্পনা আরও দশটি নগরীর মতোই একটি সরকারি ডাটা সম্পদ তৈরি করা, যাকে পরিণত করা যাবে উপকারী অ্যাপস ও সার্ভিসে। এটি এরই মধ্যে উদ্ভাবন করা হয়েছে কিছু অ্যাপস। যেমন HillsAreEvil, যা সুযোগ করে দেয় নগরীর প্রবেশযোগ্য রুটগুলোকে জানার। যাদের হুইল চেয়ারে করে চলাফেরা করতে হয়, তাদের নানা মোবাইলটি ইনফরমেশন পাওয়ার সুযোগ করে দেয় এই অ্যাপ। ব্রিস্টল পদক্ষেপে আছে গ্রিন অ্যাজেন্ডাও। ব্রিস্টল কাউন্সিলের রয়েছে এর নিজস্ব এনার্জি কোম্পানি। ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের একটি বিনিয়োগ কাউন্সিলকে সহায়তা করছে উইন্ড টারবাইন ও ২৮০০ ইউনিটের সৌর প্যানেল ও স্মার্টমিটারসমৃদ্ধ সামাজিক আবাসন সৃষ্টি করতে। এই উদ্যোগ ও অন্যান্য পদক্ষেপের ফলে ব্রিস্টল অর্জন করেছে ২০১৫ সালের 'ইউরোপিয়ান গ্রিন ক্যাপিটাল' খেতাব।

ব্রিস্টল : নিজেকে স্মার্ট করে গড়ে তোলায় নিয়েছে অন্য ধরনের উদ্যোগ

আইসিটি ও স্মার্টসিটি

একজন সাধারণ মানুষের কাছে একটি স্মার্টসিটি হচ্ছে এমন একটি শহর, যেখানে যথাসময়ে যথাযথভাবে সবকিছু হাতের কাছে পাওয়ার একটি সমন্বিত ব্যবস্থা বা ইন্টিগ্রেটেড সেটআপ কার্যকর রয়েছে। কিন্তু, যারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ও এর ক্ষমতা সম্পর্কে জানেন ও বোঝেন, তাদের জন্য স্মার্টসিটি হচ্ছে স্মার্ট ডিভাইসের একটি ইন্টিলিজেন্ট নেটওয়ার্কিং, যা আপনার সিটিকে চালু রাখতে পারে সর্বোত্তম দক্ষ ও কার্যকর উপায়ে। স্মার্টসিটিতে ব্যবহার হয় নতুন নতুন প্রযুক্তি ও নানা ধরনের গেজেট, যা নগরবাসীর জন্য নগরটিকে অধিকতর বসবাসযোগ্য, কার্যকর, প্রতিযোগিতা-সক্ষম করে তোলে। আর এর মধ্য দিয়ে নগরের উন্নতি ও সমৃদ্ধি আসে। তবে এই উন্নতি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে গিয়ে কোনো মতেই নগরবাসীর জীবনমান প্রশ্নে কোনো ধরনের আপোসের অবকাশ স্মার্টসিটির অভিধানে নেই।

স্মার্ট ইকোনমি : স্মার্টসিটির ক্ষেত্রে স্মার্ট ইকোনমি বলতে সাধারণত স্মার্ট ইন্ডাস্ট্রিকেই বোঝায়। এখানে 'স্মার্ট' শব্দটি শুধু আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি বা বিজনেসেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা অন্তর্ভুক্ত করে সব ধরনের শিল্পকে। তবে এসব শিল্প এর নিজের স্বার্থেই শিল্পোৎপাদন প্রক্রিয়ায় আইসিটি গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট করে।

ব্যবসায়ে আইসিটির ব্যবহার : নতুন ডিজিটাল সমাজের বাস্তবতার প্রভাব অবধারিতভাবে পড়েছে কোম্পানিগুলোর ওপর। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে কোম্পানিগুলোকে সে বাস্তবতাকে মেনে নেয়া আর কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বজুড়ে সে বাস্তবতার অনুধাবন কোথাও বেশি, কোথাও কম। ফলে কোথাও ব্যবসায়-প্রক্রিয়ায় আইসিটির ব্যবহার প্রবল, আবার কোথাও কম। তবে ব্যবসায়ে আইসিটির ব্যবহার নেই, এমনটি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। স্মার্টসিটির ব্যবসায়ে আইসিটির ব্যবহার থাকবে না, সেটাও অকল্পনীয়। বরং স্মার্টসিটিকে এর 'স্মার্ট' নামটি সার্থক করে তোলার প্রয়োজনে এতে একদম হালনাগাদ আইসিটির ব্যবহার হওয়াটাই স্বাভাবিক। স্মার্টসিটির স্মার্ট ফিউচার নিশ্চিত করতে উন্নত প্ল্যাটফরম ও ইন্টারনেটের ওপর নির্ভর করতে হবে সবচেয়ে বেশি মাত্রায়। নতুন নতুন ব্যবসায় যাতে সৃষ্টি হয়, সেজন্য স্মার্টসিটি কর্তৃপক্ষকে পরিকল্পনা করতে হবে উদ্যোক্তাদের সহায়তা দেয়ার জন্য টেকসই একটা সহায়তা-ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য। এ ধরনের স্মার্টসিটিতে যেকোনো সিভিক এজেন্সির ই-ইনিশিয়েটিভে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যবসায়ের চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে এই সহায়তা-ব্যবস্থার একটি প্ল্যাটফরম তৈরি রাখবে। এর ফলে নিশ্চিত হবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকার মতো আয় অর্জনের বিষয়টি। একটি পূর্বশর্ত হিসেবে স্মার্টসিটিগুলোতে ভবিষ্যৎ রেডি বিজনেস সাপোর্ট ▸

দিতে সক্ষম অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে এবং এর উন্নয়ন সাধন করতে হবে। এসব নানা অবকাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সায়েন্স কমপ্ল্যাক্স, আইসিটি পার্ক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক ও বিজনেস ইনকিউবেটর।

স্মার্ট পিপল : সবিশেষ উল্লেখ্য, ডিজিটালসিটি আর স্মার্টসিটি সমার্থক নয়। ডিজিটালসিটি ও স্মার্টসিটির মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষেত্রে এর অধিবাসীও একটি পার্থক্যকারী উপাদান। স্মার্টসিটির নাগরিকেরাও হবে স্মার্ট। একটি স্মার্টসিটির নাগরিক কতটুকু স্মার্ট হবে, তা বিবেচিত হবে তার দক্ষতা ও শিক্ষার পর্যায় সাপেক্ষে। স্মার্টপিপলের থাকবে নানাধর্মী সক্ষমতা ও গুণাবলী। যেমন– তিনি আইসিটি ব্যববহারে কতটুকু সক্ষম, কতটুকু সামাজিক, সমাজজীবনে কতটুকু মিথস্ক্রিয়া-সক্ষম এবং বাইরের দুনিয়ায় নিজেকে তুলে ধরতে তিনি কতটুকু সক্ষম ইত্যাদি নানা ধরনের বিষয়।

শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ : স্মার্টসিটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য হচ্ছে, এ সিটির সিটিজেন কতটুকু শিক্ষিত-প্রশিক্ষিত হবে। আর একটি স্মার্টসিটিতে এই প্রয়োজন মেটাতে থাকা চাই বিভিন্ন পর্যায়ের 'নলেজ অ্যান্ড স্কিল ইম্পার্টিং সেন্টার'। একটি স্মার্টসিটিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা স্কিল ডেভেলাপমেন্ট সেন্টার অর্থই হচ্ছে স্মার্টসিটির স্মার্টনেস বাড়িয়ে তোলা। একটি পরিকল্পিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেই কাজ শেষ হয়ে যাবে না। এ প্রতিষ্ঠানকে তৈরি রাখতে হবে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী করে। বিশ্বায়নের ও নতুন প্রযুক্তিসূত্রে আসা পরিবর্তনের বিষয়টি এখানে বিবেচ্য।

ই-লার্নিং : নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটে ব্রেকনেক স্পিডে, অর্থাৎ দুর্ঘটনা ঘটার মতো বিপজ্জনক গতিতে। সে জন্য স্মার্টসিটির ক্লাসরুমগুলো এ বিষয়টি মাথায় রেখে এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে, যা ডিজিটাল ডিভাইড যথাসম্ভব কমানোর ওপর আলোকপাত করে। এ জন্য প্রয়োজন শিক্ষকদের দক্ষতার উত্তরোত্তর উন্নয়ন সাধন। তাদেরকে অব্যাহতভাবে পরিচিত করে তোলা চাই নতুন প্রজন্মের ডিজিটাল লার্নিং ও রিসোর্স সম্পর্কে। নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে উন্নয়ন ঘটাবে শিক্ষাব্যবস্থার এবং এ থেকে আসবে নানা সুফল। যেমন– কমবে শিক্ষার খরচ, নিজের পছন্দের সময়ে শেখার সুযোগ, ভার্চুয়াল এডুকেশন সেন্টারগুলোর মাধ্যমে অধিকতর ইন্টারেকশনের সুযোগ। স্মার্টসিটির নাগরিকেরা পাবে জীবনভর বা লাইফলং লার্নিংয়ের সুযোগ। নয়া লেবার মার্কেট ডিনামিক্সে অর্থাৎ নয়া শ্রমবাজারের গতিধারায় লাইফলং লার্নিং হয়ে উঠেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য। স্মার্ট এডুকেশনাল সেন্টারগুলোকে লাইফলং লার্নিং প্রসেসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহতভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

মানব মূলধন : বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাকেন্দ্রগুলো হচ্ছে ইনোভেশন ইকোসিস্টেমে মুখ্য ভূমিকা পালনকারী। এ কারণে স্মার্টসিটিগুলোতে কোম্পানি ও নলেজ সেন্টারগুলোর মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলা দরকার। এমনটি নিশ্চিত করতে পারলে এরা স্মার্টসিটিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারবে।

গবেষণা ও উন্নয়ন এবং উদ্ভাবন : গবেষণা ও উন্নয়ন (আর অ্যান্ড ডি) এবং উপকারিতা সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি কম-বেশি সবার আছে। কিন্তু একটি স্মার্টসিটিতে এর সাথে জুড়ে দিতে হবে আরেকটি শব্দ। আর এই শব্দটি হচ্ছে 'উদ্ভাবন' আর 'ইনোভেশন'। ফলে স্মার্টসিটির ক্ষেত্রে এ পদবাচ্যটি হবে 'গবেষণা ও উন্নয়ন এবং উদ্ভাবন' বা 'আর অ্যান্ড ডি অ্যান্ড আই'। প্রতিটি স্মার্টসিটিই একটি থেকে আরেকটি কোনো না কোনোভাবে আলাদা হলেও একটি স্মার্টসিটিকে আর অ্যান্ড ডি'র সর্বোচ্চ সুফল ঘরে তুলতে হলে ইনোভেশনের ওপর জোর দিতে হবে।

স্মার্ট গভর্ন্যান্স : একটি স্মার্টসিটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে স্মার্ট গভর্ন্যান্স। স্মার্ট গভর্ন্যান্সে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে নাগরিক সেবায় অংশগ্রহণ ও ই-গভর্ন্যান্সের স্মার্টইউজ। একটি স্মার্টসিটিতে বিভিন্ন সরকারি সেবায় একটি পরিপূর্ণ অনলাইন সেটআপ প্রত্যাশিত। একবার যদি জনপ্রশাসনে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করে অনলাইন পাবলিক সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তবে আশা করা যায় নাগরিক-সাধারণ ও ব্যবসায়ীদের কাছে সরবরাহ করা সরকারি সেবার মান ও উৎপাদনশীলতা বেড়ে যাবে। এর মাধ্যমে যেকোনো স্থান থেকে যেকোনো সময়ে দ্রুত ও কম খরচে সরকারি সেবায় সহজ প্রবেশ নিশ্চিত হবে। নাগরিক-সাধারণকে যেসব সেবা অনলাইন সার্ভিসের মাধ্যমে দেয়া যেতে পারে, এর মধ্যে আছে : অনলাইনে অভিযোগ দায়ের, সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট ও প্রতিবেদনের মতো নানা ধরনের দলিলের জন্য অনলাইনে আবেদন ও পাওয়ার সুযোগ, কর নিবন্ধন ও কর পরিশোধের সুযোগ ইত্যাদি।

কানেকটিভিটি ও আইসিটি অবকাঠামো : আমাদের যোগাযোগ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, শিক্ষা-প্রশিক্ষা, বিনোদন ও কাজে ইন্টারনেট এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। আজকের দিনে ইন্টারনেট ছাড়া জীবন কল্পনা করা যায় না। সে কারণে শুধু নগরে নয়, গ্রামে-গঞ্জে ইন্টারনেটের ব্যবহার শুধু বেড়েই চলেছে। মোবাইল ইন্টারনেট প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে ইন্টার যোগাযোগ আরও উন্নততর পর্যায়ে উঠে আসছে। ব্যবহারকারীদের চাহিদা ও ক্রমবর্ধমান ইন্টারনেট ব্যবহারের চাহিদার বিষয়টি মাথায় রেখে স্মার্টসিটিগুলোকে পরিকল্পনা করতে হবে ব্রডব্যান্ড ও দ্রুতগতির ইন্টারনেট কভারেজ নিশ্চিত করার ব্যাপারে। দ্রুতগতির ইন্টারনেট কভারেজের বাইরে মনোযোগ দিতে হবে বিজনেস ও পাবলিক ইউটিলিটি এরিয়ায় পাবলিক ওয়াইফাই স্পট গড়ে তোলার ব্যাপারে। কর্তৃপক্ষকে খরচ করতে হবে ইনফরমেশন কিয়স্ক সৃষ্টির পেছনে, যেখান থেকে সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।

স্মার্ট এনভায়রনমেন্ট : স্মার্ট এনভায়রনমেন্টে নাগরিক-সাধারণের বসবাস নিশ্চিত করতে হলে হালনাগাদ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নগরীর পরিবেশ দূষণ ঠেকাতে হবে। স্মার্ট এনভায়রনমেন্টের বিষয়টির ওপর জোর দিয়ে ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠছে কার্বন-নিউট্রাল স্মার্ট গ্রিনসিটি।

সিকিউরিটি : বিশ্বের নগরগুলোতে নিরাপত্তা ঝুঁকি দ্রুত বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর নগরগুলোতে এ ঝুঁকি বেশি হারে বাড়ছে। তাই স্মার্টসিটির পরিকল্পকদের নিরাপদ সিটি গড়ে তোলার চিন্তাটিও মাথায় রাখতে হচ্ছে। আর এ ক্ষেত্রে তাদের হাতিয়ার হচ্ছে আইসিটি। এ জন্য স্মার্টসিটিতে থাকছে কন্ট্রোল রুম। এখান থেকে আইসিটিভিত্তিক ভিডিও সার্ভিলেন্স সিস্টেমের মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নগরকেন্দ্রে বসেই নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে। জরুরি মুহূর্তে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে এখান থেকে স্মার্টসিটির বাইরের কোনো বাহিনীর সহায়তা চাইতে পারে।

ই-হেলথ : নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডায়াগনোসিস থেকে শুরু করে রোগীর ওপর সতর্ক নজর রাখা, স্বাস্থ্যসেবা সংস্থাগুলোর ▸

ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হবে স্মার্টসিটিতে। আইসিটি ব্যবহারের ফলে নগরবাসী স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য পাবে সহজে। সুযোগ থাকবে রিমোট ট্রিটমেন্ট কিংবা টেরি-অ্যাসিস্টেন্সের। অনলাইন ডিজিটাল সার্ভিসে অনেক মারাত্মক রোগী সুযোগ পাবে দূরবর্তী কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসা পরামর্শের।

স্মার্টসিটি হুইল

ড. বয়েড কোহেন একজন আরবান ক্লাইমেট স্ট্র্যাটেজিস্ট। বিভিন্ন সিটি, কমিউনিটি ও কোম্পানিকে তিনি স্মার্ট, ইনোভেটিভ ও কার্বন ইকোনমি বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তিনি 'ক্লাইমেট ক্যাপিটেলিজম : ক্যাপিটেলিজম ইন দ্য এইজ অব ক্লাইমেট চেঞ্জ' বইয়ের সহ-লেখক। বর্তমানে অধ্যাপনাসহ আরও নানাধর্মী কাজ করছেন চিলির সান্টিয়াগোর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্মার্টসিটি নিয়ে তার কাজ করার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তিনি হাজির করেছেন স্মার্টসিটি ধারণা ব্যাখ্যার নতুন মডেল নিয়ে। তিনি এর নাম দিয়েছেন 'স্মার্টসিটি হুইল'। আবার একে 'স্মার্ট এনভায়রো' নামেও অভিহিত করা হয়।

স্মার্টসিটি হুইল নামের মডেলটি উদ্ভাবন করতে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন অন্যদের কাজ থেকে। এর মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছে– ভিয়েনা ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির সেন্টার অব রিজিওন্যাল সায়েন্সের কাজ, গ্রিনসিটি ইনডেক্স নিয়ে সিমেন্স কোম্পানির কাজ, বুয়েন্স আয়ার্সের মডেল টেরিটরিয়্যালের কাজ। বেশিরভাগ নগর একটি ব্যাপারে একমত হতে পারে : স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট এনভায়রনমেন্ট, স্মার্ট গভর্ন্যান্স, স্মার্ট লিভিং, স্মার্ট মোবিলিটি ও স্মার্ট পিপলের মধ্যে নিহিত রয়েছে সত্যিকারের একটি মূল্য। 'স্মার্টসিটি হুইল' চিত্র থেকে এটুকু স্পষ্ট, প্রত্যাশিত এসব লক্ষ্যের প্রত্যেকটি অর্জনের জন্য রয়েছে তিনটি করে মুখ্য নিয়ামক বা 'কি ড্রাইভার'। আর এসব ড্রাইভারের প্রতিটির রয়েছে শতাধিক ইন্ডিকেটর বা নির্দেশক। 'স্মার্টসিটি হুইল' ব্যবহার করে একটি সত্যিকারের স্মার্টসিটি তিনটি ধাপে এর স্মার্টসিটির কৌশল বাস্তবায়ন করতে পারে।

ধাপ-০১ : নাগরিকসংশ্লিষ্ট একটি রূপকল্প

নাগরিকদের সাথে নিয়ে প্রথমেই তৈরি করুন একটি ভিশন বা রূপকল্প। কানাডার ভ্যাঙ্কুভারের মেয়র রবার্টসন এবং তার আগের অনেকেই গ্রিনসিটির ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছেন। মেয়র রবার্টসন ও তার 'গ্রিনেস্ট সিটি অ্যাকশন টিম' ৩০ হাজারেরও বেশি নাগরিককে সংশ্লিষ্ট করেন ২০২০ সালের উপযোগী নগর গড়ার প্রক্রিয়ার সাথে। এই সিটি সোশ্যাল মিডিয়া ডিজিটাল টেকনোলজি ব্যবহার করে নাগরিক-তাড়িত জনসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে দেয়া হয়। যেমন– কোনো বক্তির বাড়িতে কিচেন টেবিল ডিসকাশন, অনলাইন ডিসকাশন ফোরাম এবং কমিউনিটি সেন্টারে কর্মশালার আয়োজন। এর মাধ্যমেই বেরিয়ে আসে 'গ্রিনেস্ট সিটি ২০২০ অ্যাকশন প্ল্যান'। এ পরিকল্পনায় ভ্যাঙ্কুভার নগরকে ২০২০ সালের মধ্যে বিশ্বের 'গ্রিনেস্ট সিটি'তে রূপান্তরের সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। ভ্যাঙ্কুভার লক্ষ্য নির্ধারণ করে 'স্মার্টসিটি হুইল'-এর প্রত্যাশিত ছয়টি মুখ্য লক্ষ্যের কমপক্ষে একটিতে বিশ্বের মধ্যে শীর্ষ অবস্থানে পৌঁছা। স্মার্টসিটিগুলোকে একই সাথে সিটিজেন ইনপুট নেয়ার জন্য ব্যবহার করতে হবে 'সিভিকপ্লাস'-এর মতো হালনাগাদ প্রযুক্তি। উল্লেখ্য, নাগরিক সাধারণকে বিভিন্ন

স্মার্টসিটি হুইল

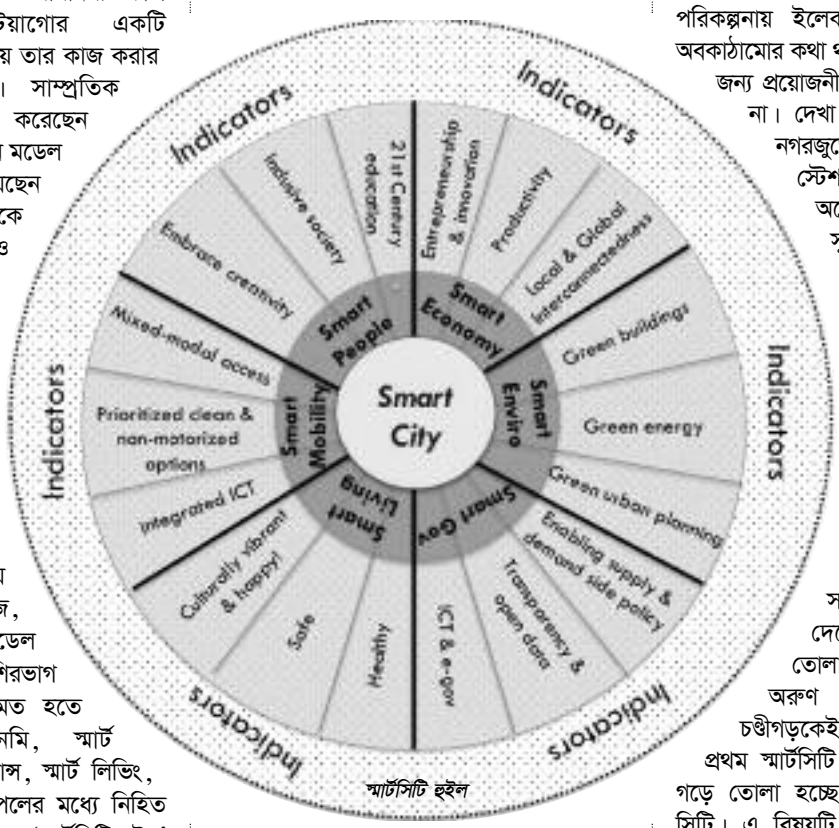

নগর প্রকল্পের ব্যাপারে তাদের সাথে যোগাযোগ ও এর সাথে এদের সংশ্লিষ্ট করার জন্য সিভিকপ্লাস জোগায় বিভিন্ন সফটওয়্যার ও টুল সুবিধা। ক্যাসল রক ও কলোরাডো একটি নতুন পার্কসিটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিল এই সিভিকপ্লাস।

ধাপ-০২ : বেসলাইন, টার্গেট ও ইন্ডিকেটর

গড়ে তুলুন একটি বেসলাইন, নির্ধারণ করুন টার্গেট এবং বেছে নিন ইন্ডিকেটর। স্মার্টসিটির ভিশন বা রূপকল্প অর্জনের জন্য সংখ্যাগত বা নিউম্যারিক্যাল টার্গেট নির্ধারণের আগে আপনার বেসলাইন বা অবস্থান নির্ধারণের বিষয়টি খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করত পারে। উদাহরণ হিসেবে আমরা স্মার্টসিটি হুইলের 'স্মার্ট মোবিলিটি' নামের লক্ষ্যটি বিবেচনা করতে পারি। স্মার্টসিটি হুইল মতে, স্মার্ট মোবিলিটির লক্ষ্যের রয়েছে তিনটি প্রধান নিয়ামক বা 'কি ড্রাইভার' : মিক্সড-মডেল অ্যাক্সেস, প্রায়োরিটিজ ক্ল্যান অ্যান্ড নন-মোটরাইজড অপশনস এবং ইন্টিগ্রেটেড আইসিটি। প্রতিটি সিটির রয়েছে এর নিজস্ব মোবিলিটি চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ। এগুলো এর জনঘনত্ব, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, বিদ্যমান অবকাঠামো ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল। ভবিষ্যৎদর্শী লক্ষ্য নির্ধারণের আগে নগরগুলোকে অবশ্যই এর বেসলাইন বা অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে।

ধাপ-০৩ : অতিমাত্রায় ঝুঁকে পড়বেন না

শুরু করতে হবে কিছুটা রক্ষণশীল পরিকল্পনা নিয়ে। অতিমাত্রায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা নিয়ে নামা যাবে না। বড় ধরনের অর্থ ও প্রাযুক্তিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি ছাড়া স্মার্টসিটি গড়ার কাজ মাঝপথে আটকে যেতে পারে। অনেক স্মার্টসিটির পরিকল্পনায় ইলেকট্রিক যানবাহন ও যথাযথ অবকাঠামোর কথা থাকে, কিন্তু অনেক সিটিরই এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসম্পদের জোগান থাকে না। দেখা গেছে, সবকিছু করা হলেও নগরজুড়ে ইলেকট্রিক গাড়ির চার্জিং স্টেশন স্থাপন হয় না প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে। এভাবে যেকোনো সুবিধা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পুরো প্রকল্পের অর্থসহায়তা সম্পর্কে আগে নিশ্চিত হওয়া চাই। তাই স্মার্টসিটি পরিকল্পনায় তহবিলের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।

ভারতে স্মার্টসিটি

ভারতের বর্তমান এনডিএ (ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স) সরকারের প্রস্তাব হচ্ছে, সে দেশে ১০০ স্মার্টসিটি গড়ে তোলা। এ বিষয়ে ভারতের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেছেন, সম্ভবত চণ্ডীগড়কেই গড়ে তোলা হবে ভারতের প্রথম স্মার্টসিটি। চণ্ডীগড়ের চারপাশে এখন গড়ে তোলা হচ্ছে বেশ কয়েকটি স্যাটেলাইট সিটি। এ বিষয়টি সম্পর্কে গিয়ে তিনি আরও বলেন, গান্ধীনগর হচ্ছে স্মার্টসিটির একটি উদাহরণ। আর নৈদা ও রায়পুরের মতো শহরে এখন বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষিত হচ্ছে।

ভারতের স্মার্টসিটিগুলো এমনভাবে গড়ে তোলা হবে, যাতে এগুলোতে বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ চলবে নিরবচ্ছিন্নভাবে। থাকবে যথাযথ স্যানিটেশন ব্যবস্থা। কার্যকরভাবে চলবে বর্জ্য নিষ্কাশন। থাকবে না রাস্তায় ভিড়। আইসিটি কার্যকরভাবে ব্যবহারের যাবতীয় সুযোগ থাকবে।

ভারতের স্মার্টসিটিগুলো হবে এককেকটি সেলফ-সাসটেইনেবল ইউনিট। এগুলো প্রধানত নির্ভর করে নিজস্ব জ্বালানির ওপর। এর সাথে থাকবে সমন্বিত সবুজ চত্বরসমৃদ্ধ আধুনিক আবাসিক এলাকা। থাকবে সুষ্ঠু সড়ক যোগাযোগ। চেষ্টা থাকবে বর্জ্যের পরিমাণ যথাসম্ভব কমিয়ে আনা। এসব স্মার্টসিটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ড্রিমপ্রজেক্ট তথা স্বপ্নপ্রকল্প।

স্মার্টসিটির ধারণায় কয়েকটি স্মার্ট গ্রিনসিটি

আজ বিশ্বের অর্ধেক মানুষ বাস করে শহর এলাকায়। কিন্তু বিশ্বের শহর এলাকার জমির পরিমাণ মাত্র ২ শতাংশ। বাকি ৯৮ শতাংশ জমিই গ্রাম এলাকায়। কিন্তু শহর এলাকায় খরচ হয় বিশ্বের তিন-চতুর্থাংশ সম্পদ। আর মাত্র ২ শতাংশ জায়গায় গড়ে ওঠা শহরগুলোতে গাদাগাদি করে বসবাস করছে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ। লোকসংখ্যা এভাবে বেড়ে চললে শহরগুলোতে লোকবসতি বাড়বে। কার্বন নিঃসরণ বাড়বে। বাড়বে দূষণ। গত বছর শুধু লন্ডন শহরে ৪ কোটি ১০ লাখ মেট্রিক টন গ্রিনহাউস গ্যাস হিসেবে পরিচিত কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ ঘটেছে। আসলে বিভিন্ন নগরীতে এ ধরনের দূষণ থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য জন্ম নিয়েছে গ্রিনসিটি নামের স্মার্টসিটি গড়ে তোলার ধারণা। সব গ্রিনসিটি বা ইকোসিটির বৈশিষ্ট্য এক– এর লক্ষ্য ফসিল জ্বালানির ব্যবহার কমানো, টেকসই ভবন নির্মাণ, সবুজ চত্বরের পরিমাণ বাড়ানো, জ্বালানিসাশ্রয়ী ও সহজলভ্য জনপরিবহনের ব্যবস্থা করা, হাঁটার উপযোগী শহর গড়া, বর্জ্য কমানো, উষ্ণায়ন প্রক্রিয়া বন্ধ করা এবং সর্বোপরি উপযুক্ত পরিবেশে বসবাসের উপযোগী নগর গড়ে তোলা। এখানে আমরা আগামী দিনের কয়েকটি স্মার্ট গ্রিনসিটির কথা জানব।

মাসদার সিটি : সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে এই মাসদার সিটির অবস্থান। কোনো গাড়ি নেই, নেই বর্জ্য, নেই দূষণ। ২২০০ কোটি ডলার ব্যয়ে গড়ে ওঠা এই মাসদার বিশ্বের প্রথম কার্বন-নিউট্রাল স্মার্টসিটি। এর জ্বালানি উৎস হচ্ছে উইন্ডমিল ও সোলার প্যানেল থেকে পাওয়া বিদ্যুৎ। এর পুরো জ্বালানি হবে নবায়নযোগ্য। অনসাইটে উৎপাদন করা কবে এর ২০ শতাংশ। বর্জ্যপানি রিসাইকেল করে তা ব্যবহার হবে সেচকাজে। এ ছাড়া মাসদারের পরিবহন পরিকল্পনা খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী। এখানে ফসিল জ্বালানিতে চলা গাড়ি নিষিদ্ধ। এর পরিবর্তে এখানে আছে ইলেকট্রিক পারসোনাল হালকা রেল ব্যবস্থা– ক্ষুদ্র ও প্রোগ্রাম-উপযোগী গাড়ি। আছে পথচারিবান্ধব হাঁটার রাস্তা। এখনও মাসদার সিটির নির্মাণকাজ চলমান। এর নির্মাণকাজ শেষ হবে ২০১৬ সালে। আশা করা হচ্ছে, ৫০ হাজার লোক এই স্মার্টসিটিতে বসবাস করতে পারবে। তবে এতে প্রথম বসবাস শুরু হয়েছে ২০০৯ সালে।

চূড়ান্ত পর্যায়ে মাসদার সিটি হবে একটি টেকনোলজি ক্লাশ্চার। এতে থাকবে গবেষণাগার, আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকা। এর স্থায়ী অধিবাসীর সংখ্যা হবে ৪০ হাজার। এতে আসা-যাওয়ার মধ্যে থাকবে আরও ৫০ হাজার লোক। নানা কারণে এটি হবে একটি বহুমুখী প্রকল্প।

ট্রেজার আইল্যান্ড : যুক্তরাষ্ট্রের কানসাস স্টেটের গ্রিনসবার্গ ২০০৭ সালের ৪ মে'র টর্নেডোর আঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। ধ্বংস হয় এর বাড়িঘর, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও গাছপালা। এর ১৫০০ অধিবাসী এখন গ্রিনসবার্গকে নতুন করে গড়ে তোলায় ব্যস্ত। এরা একে গড়ে তুলতে চাইছে আমেরিকার অন্যতম গ্রিনসিটি হিসেবে। এই প্রকল্পটি এনার্জি উৎপাদক ও অন্যদের নজর কেড়েছে। ডিসকভারি কমিউনিকেশনস এবং টাইটানিক খ্যাত অভিনেতা লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিও একটি টিভি সিরিজের প্রামাণ্যচিত্রে ধ্বংসস্তূপ থেকে গ্রিনসবার্গের উত্থানের বিষয়টি তুলে ধরছেন। এ সিরিজটির নাম দেয়া হয়েছে 'ইকো টাউন'।

ট্রেজার আইল্যান্ডকে গ্রিনসিটিতে রূপান্তর স্মার্টসিটির ইতিহাসে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মানুষের তৈরি এই কৃত্রিম দ্বীপের আয়তন ৪০০ একর বা দেড় বর্গকিলোমিটার। ১৯৩৯ সালে সানফ্রান্সিসকো উপসাগরে এ দ্বীপটি গড়ে তোলা হয়েছিল 'গোল্ডেন গেট ইন্টারন্যাশনাল এক্সপজিশনে'র জন্য। উদ্দেশ্য ছিল এ এক্সপজিশন তথা প্রদর্শনীর পর এ দ্বীপভূমিতে নির্মিত হবে একটি বিমানবন্দর। কিন্তু সে বাণিজ্যিক বিমানবন্দরের পরিকল্পনা কখনই বাস্তবায়ন করা হয়নি। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই দ্বীপটির দখল নেয় যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী। ১৯৯৬ সালে এই ঘাঁটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়। সেই সময় থেকে সেখানে বসবাস করছে ৩ হাজার লোক।

ট্রেজার আইল্যান্ডের পাশেই রয়েছে ইয়ার্বা বুয়েনা নামের আরেকটি দ্বীপ। ২০০৯ সালে নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী এই দুই দ্বীপকে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে পরিবেশবান্ধব স্মার্ট গ্রিনসিটি হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বলা হয়, ট্রেজার আইল্যান্ড হবে যুক্তরাষ্ট্রের ইকো-ফ্রেন্ডলি আরবান আইডিয়ার একটি টেস্ট বেড।

ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ভিক্টোরিয়া : ভিক্টোরিয়াকে ২০১২ সালের মধ্যে কার্বন-নিউট্রাল করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। এর ডকসাইড গ্রিন প্রজেক্ট এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাছাকাছি নিয়ে আসে। ডকসাইড গ্রিন প্রকল্পের পরিবেশ সম্পর্কিত টেকসই পরিকল্পনার সাথে যোগ হয়েছে আবাসিক, বাণিজ্যিক, হালকা শিল্প এবং ১৫ একর জায়গার ওপর গ্রিন স্পেস তৈরির বিষয়ও।

ডকসাইড গ্রিন প্রকল্পের লক্ষ্য উত্তর আমেরিকার প্রথম কার্বন-নিউট্রাল কমিউনিটি হওয়া। ডকসাইড গ্রিন প্রকল্প কী করে এ লক্ষ্য অর্জন করবে? এ প্রকল্পের মাধ্যমে ভবন, পরিবহন, জ্বালানি ও বর্জ্য নিষ্কাশনের একটি সম্মিলিত গ্রিন সলিউশনের চেষ্টা করা হবে।

শুরুতেই আসা যাক ভবনগুলোর কথায়। ডকসাইড গ্রিনের ভবনগুলো নির্মাণ হচ্ছে বন থেকে উদ্ধার করা কাঠ দিয়ে। আগে এই বন এলাকা তলিয়ে থাকত রিজার্ভারের পানিতে। কার্যকর জ্বালানির অ্যাপ্লায়েন্স ও ফিক্সার, গ্রিন রুফসহ কার্বন ফুটপ্রিন্ট মনিটর সংযোজন করা হবে ভবনের ভেতর থেকে। সেখানকার ড্রাইভওয়েতে থাকবে না কোনো কার। এ ছাড়া ডকসাইড গ্রিনের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বাইক ও হেঁটে চলার রাস্তা, ট্র্যানজিট ও একটি হারবার ফেরি। শতভাগ বর্জ্য শোধিত হবে অনসাইটে এবং পরিশোধিত পানি আবার ব্যবহার হবে টয়লেট ফ্ল্যাশ ও কৃষিজমির সেচকাজে। বায়োমাস-গ্যাসিফিকেশন প্ল্যান্ট কাঠের বর্জ্য রূপান্তর করবে তাপ ও গরম পানি গরম করার জ্বালানিতে।

এই ইনোভেটিভ গ্রিন কমিউনিটি তৈরির কাজ এখন চলমান। এর পুরো নির্মাণ শেষে প্রকল্প এলাকাটি হয়ে উঠবে ২৫০০ লোকের একটি গ্রিন কমিউনিটির আবাসস্থল।

প্রসঙ্গ বাংলাদেশ

আগেই বলা হয়েছে, বিশ্বের শহরগুলো গড়ে উঠেছে মাত্র ২ শতাংশ বিশ্বভূমিতে। ফলে নগরগুলো হয়ে উঠেছে অতিমাত্রায় ঘনবসতিপূর্ণ। এর ফলে নাগরিক সুবিধা যেমন ব্যাহত হচ্ছে, তেমনি পরিবেশ সমস্যাও বাড়ছে। এসব মোকাবেলায় আমাদের ভাবতে হচ্ছে স্মার্টসিটির কথা। বাংলাদেশে এ সমস্যা মোকাবেলা রীতিমতো একটি চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্মার্টসিটি গড়ে তোলা হতে পারে প্রধান বিবেচ্য। আমাদের রাজধানীসহ বড় নগরগুলোকে আদর্শ মানের স্মার্টসিটি গড়ার কাজটি করা মোটেও সহজ কাজ নয়। তবে আমরা নতুন নতুন যেসব উপশহর এই আধুনিক সময়ে গড়ে তুলছি, সেগুলোকে কী করে স্মার্টসিটিতে রূপ দেয়া যায়, তা ভাবতে হবে সবার আগে। আর রাজধানীসহ অন্যান্য বড় শহরকে স্মার্টসিটির নানা উপাদানের যেগুলো সংযোজন সম্ভব, তা পাশাপাশি করার বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে। ভুললে চলবে না, বিশ্বের সবচেয়ে জনভারে ন্যুব্জ বাংলাদেশের নগরগুলোও তেমনি জনভারে ন্যুব্জ। এর ওপর গ্রামের মানুষের শহরমুখো হওয়ার প্রবণতা রোধেও আমরা চরম ব্যর্থ গ্রামীণ অর্থনীতির যথাযথ পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করতে না পারার করণে। ফলে আমাদের শহরগুলোর নাগরিকসেবা শহরবাসীর বেড়ে চলা সংখ্যার সাথে সমান্তরালভাবে চলতে পারছে না। তাই স্মার্টসিটি গড়ে তোলাটা আমাদের জন্য বড় প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে। এ বিষয়টি এড়িয়ে চলার আর কোনো অবকাশ নেই। দেখার বিষয়, আমাদের নগর পরিকল্পকেরা ও বেসরকারি খাতের আবাসন প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তারা এ ব্যাপারে কতটুকু গুরুত্ব দেন। একই সাথে বিদেশী বিনিয়োগকারীদেরকেও আমাদের উৎসাহ জোগাতে হবে স্মার্টসিটি গড়ে তোলায় উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসতে কজ